দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

14

একটি প্রকৃত উদ্যোগ চাই

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-১৯৯৫' উপলক্ষে একটি পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রতিবছরই হতে দেখা যায়। এবারও দেশের ২৫টি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ৩৫ জন শিক্ষক এবং ৭২ জন সেরা ছাত্র পুরস্কৃত হয়েছেন। দেশে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এ ধরনের সপ্তাহ পালন এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। অবশ্য যদি একে নিছক গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে না দেয়া হয় এবং প্রতিবছর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি, ভাষণদান আর স্বহস্তে পুরস্কার প্রদানকেও একটা আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে পরিণত না করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য একটা চমৎকার দিকনির্দেশনা রয়েছে। এতে ব্যক্ত হয়েছে ছাত্র সমাজের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হবার আহ্বান, শিক্ষাদান ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষকদের অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান এবং ক্যাম্পাসে সহিংসতা আর সেশনজটের মতো মারাত্মক বিষফোঁড়া নির্মূলে দলমত নির্বিশেষে সকল সচেতন নাগরিকের সহযোগিতা কামনা।

প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। ছাত্রদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে অধ্যয়ন ও বিদ্যার্জন। ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার প্রতি মনোনিবেশ। কোন বড় রকমের জাতীয় সঙ্কট, বিপর্যয় বা উপপ্লবের অনুপস্থিতিতে অধ্যয়ন ও বিদ্যার্জনই হওয়া উচিত তাদের প্রধান করণীয়। দেশের শিক্ষার্থীগণ এ সত্যটি মোটামুটি অবহিত। কিন্তু অবহিত থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছে না কতিপয় বাস্তব অবস্থা ও দেশের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে। এই অবস্থা ও পরিস্থিতি দূরীকরণ ব্যতীত কেবল আহ্বান-উপদেশে বাঞ্ছিত ফললাভ কিভাবে আশা করা যেতে পারে? আহ্বান-উপদেশ তো প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী-নেতাদের মুখেও কম শোনা যায় না। কিন্তু সেসব কতটা ফলপ্রসূ হয়?

নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, আদর্শবাদী ও যোগ্য শিক্ষকরা এখনও আছেন এবং তাঁরা আছেন বলেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখনও টিকে রয়েছে। তবে তাঁদের সংখ্যা দ্রুত ক্ষীয়মাণ। নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের, ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার, দুর্নীতির, বণিকী প্রবণতার, ফাঁকিবাজি ও দায়িত্বহীনতার এবং সর্বোপরি দলাদলি ও দলীয়করণের যে সর্বনাশা স্রোত বইছে তা থেকে আত্মরক্ষায় এই স্বল্প সংখ্যককে শিক্ষা সপ্তাহে প্রদত্ত স্বর্ণপদক আর কতদিন সহায়তা করতে পারবে?

সারা দেশের শিক্ষাঙ্গন আজ সন্ত্রাসকবলিত। এমন কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সন্ত্রাস নেই। বার বার ছাত্র সংঘর্ষ হচ্ছে। বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে। চলছে অস্ত্রবাজি আর মস্তানির খেলা। ছাত্র নামধারী মুষ্টিমেয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী জিম্মি করে রেখেছে দেশের সকল ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের। খুন করছে, আহত করছে পরস্পরকে এবং নিরীহ ছাত্রদেরকে। গত এপ্রিলে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছিল যে, একমাত্র বরিশাল মেডিক্যাল কলেজই ৬ বছরে ৪শ' দিন বন্ধ ছিল অনির্ধারিতভাবে। বারে বারে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের কারণে একইভাবে বন্ধ থেকেছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হতাহত হয়েছে শিক্ষার্থীরা, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তাদের শিক্ষা জীবনের। সেশনজটের শিকার হয়েছে তারা। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ বিলম্বিত হচ্ছে। দেশে শিক্ষার প্রসার বিঘ্নিত হয়েছে দারুণভাবে।

বর্তমান মুহূর্তে সন্ত্রাস এবং সেশনজটই প্রধান সমস্যা। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত না করে সেশনজটের নিরসন সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাত বছরে সেশনজট নিরসনে এক কোটি টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু সাফল্য এসেছে সামান্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করেন অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে, পরীক্ষা গ্রহণ করে, সময়মত ফল প্রকাশ করে, যথাযথভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন করে সুফল পেতে পারেন। কিন্তু সন্ত্রাস যদি অব্যাহত থাকে, অনির্ধারিতভাবে যদি ক্যাম্পাসমূহ বন্ধ থাকে, বছর বছর যদি শত শত শিক্ষাদিবস নষ্ট হয় তাহলে এ আশা কিভাবে সফল হবে? সুতরাং প্রথম কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস দমন এবং ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবেই এ দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন এবং এটা সম্ভব করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল সচেতন নাগরিকের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এ ধরনের আহ্বান নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেও একাধিকবার একথা বলেছেন। বলেছেন প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীসহ অন্যান্য দলের নেতারাও। 'সন্ত্রাসীরা কোন দলের নয়, তাদেরকে স্রেফ সন্ত্রাসী হিসাবেই গণ্য করতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীয় বিচার বা স্বার্থচিন্তার উর্ধে উঠে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে'— এসব কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু কথার সাথে কাজ মিলেনি। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কারা, কাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ওরা সন্ত্রাসী, কারা ওদের নেতা-মুরুব্বী, অর্থ-অস্ত্রের যোগানদার— এসব তো কোন গোপন কথা নয়। দেশবাসী জানে যে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির নামে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তারা দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং দু'একটা ছোটখাটো দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এসব দলের নেত্রী-নেতারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলতে এবং সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা বলতে কেউ কারও অপেক্ষা পিছিয়ে নেই। তবু দলমত নির্বিশেষে সহযোগিতার ভিত্তিতে এত বড় সমস্যাটার মীমাংসাকল্পে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রকৃত উদ্যোগ তো এ যাবত দেখা গেল না। প্রকৃত উদ্যোগের এই অনুপস্থিতিই কি সংশ্লিষ্ট দলসমূহের নেত্রী-নেতাদের আহ্বান-উপদেশ-সদিচ্ছার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই তো এ রকম একটা উদ্যোগ নিতে পারেন এবং নিলে সেটা শোভনও হয়।